:: চতুর্দশ অন্তর্জাল সংখ্যা ::

২৪ বৈশাখ, ১৪২৮/ 24.05.2021

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
ভারতীয় নারী ও স্বামী বিবেকানন্দ	শ্রী প্রণব ঘোষ
ভক্ত কবীর	শ্রী অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ
শ্রীমায়ের আহ্বান	শ্রীমা
জীবনানন্দের ধূসর জগৎ	শ্রী দিব্যজ্যোতি রাহা
বৈতরণী পার	শ্রীমতী বাণীপ্রভা মালব্য
কালো ছত্রাক	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by
Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.
Website : https://www.parthasarathipatrika.com
Contact : 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

প্রীতি-কণা

নিঃস্বার্থ ভাবে, নীরবে কর্ম কর । কি পেলে আর কি না পেলে সে হিসাব কোরো না। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে কর্ম করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

DO NOT COPY

পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

শ্রীপ্রীতিকুমারের লেখা চিঠিগুলিও প্রায় শেষ হয়ে এলো। সকলেই প্রায় চিঠিগুলি সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন দেখে আমার খুব কষ্ট হয়। মনে হয় আরও চিঠি কেন গুছিয়ে রাখিনি। আসলে বুঝতে পারিনি। আমারই তো আগে চলে যাবার কথা ছিল --। অন্ততঃ তিনি তাই বলতেন। আগে যাইনি বলে এখন আর দুঃখ করিনা। আছি বলে তাঁকে স্বমহিমায় মহিমান্বিত দেখতে পাচ্ছি। যে ধারণা আমার ছিল না, যে উপলব্ধি আমার ছিল না, সেই উপলব্ধি তিনি আমার মধ্যে এনে দিচ্ছেন। আমি বুঝতে চাই, এগিয়ে যেতে চাই। তিনি প্রায় প্রতিটি চিঠিতে লিখতেন, "ঁমা তোমার হাত ধরে নিয়ে চলেছেন। আমি সদাসর্বদা তোমার পাশে আছি।" তখন বিশ্বাস করতাম না – তাঁকে ঠাট্টা করতাম। বড় অল্প বয়সে তাঁর জীবনে এসেছিলাম, তাই --। আজ আর আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে সত্যি তিনি আমার পাশে পাশে আছেন। অতন্দ্র প্রহরীর মত আমাকে পাহারা দিচ্ছেন।

16.04.62

প্রিয় শ্বেতা,

আজ মার চিঠি পেলাম, মা বুধবার কলকাতায় আসছেন গুরুদাসের বিয়েতে। লিখেছেন আমাদের বাসার ঠিকানা জানেন না, তাই হয়ত ওদের বাসায় উঠবেন। আজ মন্টুকে ফোন করে ঠিকানা বলে দিয়েছি, আমাদের সিঁথির বাসায় যেন মাকে নিয়ে ওঠে। আরও বলে দিয়েছি বিয়েতে যা দিতে হয় তা যেন কেনে। মন্টু যদি কেনে তাহলে আর তোমাকে কিনতে হবে না। মা গেলে তুমিও মায়ের সঙ্গে যেও। কুড়ি টাকা পবনবাবু তোমাকে দিয়ে আসবেন। যদি কাপড় কিনতে হয় কিনবে। মাকে যত্ন কোর। সাবধানে থেকো। মা যদি বলেন তবে বিয়ে বাড়িতে রাত্রে থেকো। তুমি সবসময় বাসায় থেকো কারণ মা কখন আসবেন ঠিক নেই। শুভেচ্ছা জেনো।

ইতি -
প্রীতিকুমার

05.09.62

প্রিয় শ্বেতা,

হঠাৎ ঠিক হওয়ায় ঝরিয়া রওনা হয়ে যাচ্ছি। শুক্রবার রাত্রে সিঁথিতে ফিরব। কলকাতায় রাস্তাঘাটে খুব গণ্ডগোল হচ্ছে। কলকাতায় আসা যাওয়া কোরনা বা বাড়ি থেকে কোথাও যেয়ো না। পাঁচ টাকা পাঠালাম, দুদিন চালিয়ে নিও। সাবধানে থাকবে।

প্রীতি জানবে। আমি ১০টায় রওনা হব।

ইতি – প্রীতিকুমার

প্রিয় শুক্লা,

আজ Jharia তে যাচ্ছি। চৌধুরীবাবু থিয়েটারে যাবার জন্য তোমার কথা বলেছিলেন। আমি বলেছি দিন কয়েক পরে যাবে। এখন থাক। তিনি তোমার জন্য একটি সেলাই কল কিনেছেন। আমাকে পীড়াপীড়ি করবার জন্য না বলতে পারিনি। তোমাকে জানানো থাকলো। শনিবার রাত্রে ফিরব। সকালে চৌধুরীবাবু যেন আমাকে শ্যামবাজার থেকে তুলে নিয়ে যান। যদি অন্য ব্যবস্থা কর সে কথা আলাদা।

শুভেচ্ছা জেনো।

ইতি –

প্রীতিকুমার

হাজারিবাগ

11.10.63

অভিন্নহৃদয়েষু,

গতকাল আটটায় হাজারিবাগ এসেছি। ষ্টেশনে সকলে ফুলের মালা দিয়ে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। আজ সকাল থেকে নানাভাবে কাজে ব্যস্ত আছি। তিনটার সময় Colliery-তে যাব। সেখান থেকে রাত্রে ফিরব। পুর্ণ দায়িত্ব নিয়ে যাতে কাজ করতে পারি সেইমত কথাবার্তা চলছে। ঁমায়ের কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। কাজের গতি দেখে মনে হয় মঙ্গল, বুধবার এখানেই লেগে যাবে। সাবধানে থাকবে। যদি তেমন দরকার পড়ে টেলিগ্রাম কোর।

DO NOT COPY

ঠিকানা–
B.P. Singh, M.P.
Ashok Villa
Hazaribag.

বিস্তারিত কাল রাত্রে জানাব। খুব সাবধানে থাকবে। কারও সঙ্গে যেন বিরোধ না হয়, নূতন জায়গা। আমার আদর ও শুভেচ্ছা জেনো।

ইতি – প্রীতিকুমার

হাজারিবাগ
11.10.63

প্রিয় বাবু,

মায়ের কথা শুনবে। একদম দুষ্টুমী করবে না। নিজে নিজে ঠিকমতো দুধ ও খাবার খাবে। মন দিয়ে পড়াশুনা করবে। তোমাকে অনেক বড় হতে হবে। আমি কাজ সেরে তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরব।

আমার আদর নিও।

ইতি –

বাবা
শ্রীপ্রীতিকুমার

হাজারিবাগ
12.10.63

অভিন্নহৃদয়েষু,

মঙ্গলবার রাত্রে এখান থেকে রওনা হব। বুধবার সকালে কলকাতায় পোঁছাব। অনেকদিন বাদে দূরে আসায় তোমার হয়ত কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তুমি হয়ত ভাবলে আশ্চর্য হবে আমি ছেড়ে আসাতে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছি। সব সময় তোমাদের কথা ভাবছি। এরই নাম "মায়া" না গভীর প্রেম ও ভালবাসা তা বিচারের ভার তোমার উপর। প্রকৃতির বাধ্যবাধকতায় আমরা চলি। সেখানে থাকে বাধা বিঘ্ন, দ্বন্দ্ব ও কখনও হতাশা। একটানা গরুর গাড়ীর চাকার কেঁচর কেঁচর আওয়াজের মতো যেন ছন্দহীন, যেন ফুল ফুটতে হয় তাই

DO NOT COPY

ফোটে। যখন আমরা উভয় হতে দূরে আসি তখনই বুঝি কি গভীর প্রেমময় সাগরে আমরা সদাসর্বদা ডুবে থাকি। সাগরের ঢেউ যেমন ভিতরের বস্তুকে দেখতে দেয় না, তেমনি আমরা সংসারের নানা ছোটখাট ও দৈনন্দিন ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ি, যার জন্য প্রেমের শাশ্বত স্পন্দন উপলব্ধি করতে পারিনা। যার জন্য সে হয় অন্তরীন। যখন সে সুযোগ পায়, তখন সে তার স্ব-স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

আদর নিও।

ইতি – প্রীতিকুমার

হাজারিবাগ

ছেলেকে লেখাঃ-

বাবা, বুধবার সকালে কলকাতায় যাব। এ ক'দিন সাবধানে থাকবে। একদম দুষ্টুমী করবে না। ঠিকমত খাওয়াদাওয়া করবে। দিদি ও মায়ের কথা শুনবে। ভালভাবে পড়াশুনা করবে। আশীর্বাদ জেনো।

আদর নিও।

ইতি-

বাবা
শ্রীপ্রীতিকুমার

ভারতীয় নারী ও স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রী প্রণব ঘোষ

প্রাচীন যুগে ভারতীয় সমাজে নারীর আসন ছিল খুবই উচ্চে। তাঁদের যেমন ছিল স্বাধীনতা, তেমনি মর্যাদা। তাঁরা স্বামীর সঙ্গে একত্রে ধর্মাচরণ করতেন, রাজনীতিতে অংশ নিতেন, পুরুষের সঙ্গে প্রকাশ্য সভায় তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন, বৈদিক স্তোত্র রচনা করতেন, আচার্য হিসাবে শিক্ষাদান করতেন, এমন কি যুদ্ধেও যোগদান করতেন।

ভারতীয় নারীর এই মর্যাদা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্বাধীনতা হারিয়ে তারা ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সতীদাহ, কৌলিন্য প্রথা, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি নানা সামাজিক কুপ্রথার ফলে তাদের জীবনে তখন রীতিমত দুরবস্থা। শিক্ষার অভাবই যে এই অবনতির মূল

DO NOT COPY

কারণ সে বিষয়ে স্বামীজীর কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি বলেছেন "ভারতের অধঃপতন হল, ভট্টাচায-বামুনরা ব্রাহ্মণেতর জাতকে যখন বেদপাঠের অনধিকারী বলে নির্দেশ করলে, সেই সময়ে মেয়েদের সকল অধিকার কেড়ে নিলে। নতুবা বৈদিক যুগে উপনিষদের যুগে দেখতে পারি-মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া মেয়েরা ব্রহ্ম বিচারে ঋষিস্থানীয়া হয়ে রয়েছেন। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী স্বগর্বে যাজ্ঞবল্ককে ব্রহ্ম-বিচারে আহ্বান করেছিলেন। এসব আদর্শস্থানীয়া মেয়েদের যখন অধ্যাত্ম জ্ঞানে অধিকার ছিল, তখন মেয়েদের সে অধিকার এখনই বা থাকবে না কেন? একবার যা ঘটেছে, তা আবার অবশ্য ঘটতে পারে। History repeats itself- ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়।" ভারতীয় নারী সম্পর্কে স্বামীজীর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বলেছেন, এ সীতা-সাবিত্রীর দেশ, পুণ্য ক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখলুম না। ও দেশে(পাশ্চাত্যে) মেয়েদের দেখে আমার অনেক সময় স্ত্রীলোক বলেই বোধ হত না- ঠিক যেন পুরুষ মানুষ। গাড়ী চালাচ্ছে, অফিসে বেরুচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে, প্রফেসারী করছে। এক মাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা বিনয় দেখে চক্ষু জুড়ায়। এমন সব আধার পেয়েও তোরা এদের উন্নতি করতে পারলিনি। এদের ভেতর জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা করলিনে। ঠিক ঠিক শিক্ষা পেলে এরা ideal (আদর্শ) স্ত্রীলোক হ'তে পারে।

সীতা সম্পর্কে স্বামীজীর কি শ্রদ্ধা না ছিল! তিনি বলেছেন, "ভারতীয় নারীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ; নারী চরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতা চরিত্র হইতেই উদ্ভূত। আর সমগ্র আর্যাবর্তে এই সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ তিনি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহামহিমময়ী সীতা – সাক্ষাৎ পবিত্রতা অপেক্ষাও পবিত্রতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী নিত্য বিশুদ্ধ স্বভাবা আদর্শ পত্নী সীতা সেই নরলোকের, এমন কি দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শ স্বরূপা মহীয়সী সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন।"

স্বামীজী মনে করতেন নারী জাতির প্রতি অবহেলাই ভারতের পতনের মূল কারণ। তিনি বলেছেন, "মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে। যে দেশে, যে জাতিতে মেয়েদের পূজা নেই, সে দেশ, সে জাত কখনই বড়

হতে পারেনা, কস্মিন কালেও পারবে না। তোদের জাতের যে এত অধঃপতন, তার প্রধান কারণ এইসব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা।"

আবার দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন নারী শিক্ষার উপর। তবে 'শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ শেখা নহে; আমাদের বৃত্তিগুলির-শক্তি সমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে। শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিকে এমনভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহার ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত হয় ও সফল হয়। এই ভাবে শিক্ষিতা হইলে ভারতের কল্যাণ সাধনে সমর্থা নির্ভীক হৃদয়া মহীয়সী নারীর অভ্যুদয় হইবে। তাঁহারা সঙ্ঘমিত্রা, লীলা, অহল্যাবাঈ ও মীরাবাঈ-এর পদাঙ্কানুসরণে সমর্থা হইবেন। তাঁহারা পবিত্রা স্বার্থশূন্যা বীর রমনী হইবেন। ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শে যে বীর্যলাভ হয়, তাঁহারা সেই বীর্য লাভ করিবেন, সুতরাং তাঁহারা বীর প্রসবিনী হইবার যোগ্যা হইবেন।'

মেয়েদের শিক্ষা কেমন হবে সে সম্পর্কেও স্বামীজী আভাস দিয়েছেন- চরিত্রবতী, ধর্মভাবাপন্না ঐরূপ প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার হবে। ধর্মপরায়নতা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার ছাত্রীদের অলঙ্কার হবে; আর সেবা ধর্ম তাদের জীবন ব্রত হবে। এইরূপ আদর্শ জীবন দেখলে কে তাদের না সম্মান করবে-কেই বা তাদের অবিশ্বাস করবে? দেশের স্ত্রীলোকদের জীবন এইভাবে গঠিত হলে তবে তো তোদের দেশে সীতা সাবিত্রী গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হবে।

স্বামীজীর কাছে জননীই ছিল নারীত্বের আদর্শ-"ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব – সেই অপূর্ব স্বার্থশূন্য সর্বংসহা, নিত্য ক্ষমাশীলা জননী।" পাশ্চাত্যে নারীত্বের আদর্শ জায়া। স্বামীজী এই আদর্শকে তুচ্ছ করেননি বরং বলা যায় তিনি দুয়ের সম্মিলন চেয়েছিলেন। এই দুই ভাবের পূর্ণ পরিণতি ঘটেছিল শ্রীশ্রীমা সারদার মধ্যে। ঠাকুরের প্রকট কালে শ্রীশ্রীমা জায়াভাবের পূর্ণ পরিণতির দৃষ্টান্ত ছিলেন। দিনের পর দিন তিনি নীরবে জগৎ কল্যাণে রামকৃষ্ণ লীলায় সহায়তা করে গিয়েছেন। ঠাকুরের দেহ-ত্যাগের পর সঙ্ঘ জননী হিসাবে তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল মাতৃত্বের সর্বোত্তম রূপটি। আদর্শ নারী বলতে যা বোঝায় স্বামীজীর চোখে শ্রীশ্রীমা ছিলেন তাই- সীতার মতো পতিপ্রাণা, সাবিত্রীর মতো তেজস্বিনী এবং গার্গী মৈত্রেয়ীর মতো ব্রহ্মবাদিনী। তাই স্বামীজী মনে করতেন শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় নারী জাগরণের সূচনা হবে এবং সৃষ্টি হবে নবযুগের সীতা, সাবিত্রী, গার্গী, মৈত্রেয়ী।

তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, খৃষ্টান নও, তুমি মানুষ। তোমার পরিচয় মানুষের। তার চেয়ে বড় পরিচয় হল, তুমি ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব। ঈশ্বরের অন্যান্য প্রিয় সৃষ্টির মতো তুমিও তাঁর প্রিয়। তাঁর পদসেবা করবার অধিকারী। এই কথাগুলি প্রায়ই বলতেন ভক্ত কবীর। একথা শুনে তাঁকে অনেকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করত কবীর জোলার নিছক পাগলামী বলে। কিন্তু ঈশ্বরের চিন্তায় তন্ময়চিত্ত ভাবুক কবীরের ভাবরাজ্য হতে যে বাণী মুখনিঃসৃত হয়ে আমাদের কর্ণকূহরে প্রবেশ করত তার ভার বেশী না হলেও ধার ছিল বেশী। তাই তা যুগ যুগান্তরের সত্য হয়ে আজও সহজসরল সাধারণের কাছে চির আদরণীয় বস্তু হয়ে বিরাজ করছে। ভক্ত কবীরের দোঁহাগুলি কালজয়ী হয়ে আজও লোকের মুখে মুখে গানের সুরে অনুরণিত হচ্ছে। ভগবানের কাছে ভক্ত প্রিয়। তাই ভক্ত কবীর ভগবানের প্রিয় হয়ে আমাদের জন্য যে জিনিস – যে বাণী রেখে গেছেন তা ঈশ্বরের মতো নিত্য, শাশ্বত এবং প্রিয় বস্তু।

ঈশ্বরকে সহজ সরল পথে পাবার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে বিশদভাবে এই ভক্তি তত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। অর্জুন একান্ত ভক্তিবলে দুর্লভ বস্তু ভগবানের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আমাদের ভক্ত কবীর ম্লেচ্ছ হয়েও পরম ভাগবত – পরম পণ্ডিত – পরম জ্ঞানী। ভক্তিশাস্ত্র বলেছেঃ

"ভক্তিরষ্টবিষা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেহপি বর্ত্ততে ।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ ।।
তস্মৈ দেয়ং তত গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহরিঃ ।।"

অর্থাৎ যে ম্লেচ্ছেও আটরকম ভক্তি বর্তমান সেই ম্লেচ্ছও পণ্ডিত, বিপ্রেন্দ্র মুণিও শ্রীমান। ভজন রহস্যাদি তাঁকেই দেবে আর তাঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করবে। তিনি শ্রীহরির মতই পূজনীয়।

"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তম নিষীদং স্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতি সামান্যাৎ স জাতি নরকং ধ্রুবং ।।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তকে শূদ্র, নিষাদ অথবা স্বপচ, এরূপ নীচজাতি বলে কিংবা অন্যান্য শূদ্রাদ্রির সঙ্গে সমান জাতি বলে দেখে, সে নিশ্চয়ই নরকে যায়। ভক্তিশাস্ত্রের এই নিগূঢ় কথার মধ্যে যে সত্যের আলোক রয়েছে তা দিয়ে ভক্ত কবীরকে বিচার করলে তিনি অবশ্যই আমাদের কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে পুণ্যতীর্থ বারাণসীর কাছাকাছি এক গ্রামে ভক্ত কবীর জন্মগ্রহণ করেন।

কবীরের জন্মকে কেন্দ্র করে নানারকম কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।

লোকে বলে জনৈকা ব্রাহ্মণ বিধবা মেয়ে জনৈক সাধুর সেবা-পরিচর্যা করেন। সাধু তাঁর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করেন, মা, সুপুত্রবতী হও। সাধুর ঐ কথা শোনার পর বিস্ময় ও দুঃখে বিধবা মেয়ের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো । তিনি সাধুকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, বাবা, আমি পতিহীনা। আমার সন্তান হলে আমাকে যে সমাজে কলঙ্কিতা ও পতিতা হতে হবে। তখন সাধু বললেন, মা তুমি আমার কথায় বিশ্বাস রাখো। তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। তুমি কলঙ্কিতা হবে না। আমি যা বলেছি তাই সত্য হবে।

কালক্রমে সাধুর বাক্য ফলে গেল। বিধবা মেয়েটি একটি সুলক্ষণযুক্ত পুত্র-সন্তান প্রসব করেন।

প্রসবের কিছুক্ষণ পর কলঙ্ক রটবার ভয়ে ভীতা হয়ে বিধবা মেয়েটি সদ্যোজাত পুত্রসন্তানকে নিয়ে নিকটবর্তী অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করলেন। তারপর তাকে একটি গাছতলায় রেখে বাড়ী ফিরে এলেন।

ওদিকে ইলু নামে এক জোলা জাতীয় মুসলমান সেই অরণ্যের ধার ধরে যেতে যেতে অরণ্যের ভিতর থেকে শিশুর কান্না শুনতে পেল। তখন সে সেই শিশুর কান্না অনুসরণ করে অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করল। তারপর খুঁজে পেতে সেই বিধবা মেয়েটি কর্তৃক পরিত্যক্ত নবজাত শিশুটিকে কোলে করে নিয়ে এলো বাড়ীতে। তাকে নিজের ছেলের মতো যত্নে মানুষ করতে লাগলো। সে ঐ শিশুর নাম রাখল 'কবীর'।

জোলাদের ঘরে কবীর মানুষ হতে লাগলেন এবং তাদের বৃত্তি গ্রহন করলেন। কালে কবীর বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ইলু তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করেন এবং যথাসময়ে বিয়েও হয় জোলা মুসলমান পরিবারের জনৈকা মেয়ের সঙ্গে। পরে কবীরের একটা ছেলেও জন্মগ্রহণ করে। তার নাম রাখা হলো কমাল। কারও কারও মতে কমাল নাকি কবীরের ঔরসজাত পুত্র নয়, পালিত পুত্র।

কবীর সংসারের সব কাজই করেন। কাজের অবসরে ভগবানের অন্যতম অবতার শ্রী রামচন্দ্রের নাম নেন। তিনি মুসলমানের পালিত এবং মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হলেও তাঁর মন প্রাণ কিন্তু একান্তভাবে হিন্দুধর্মের অন্যতম অবতার শ্রী রামচন্দ্রের প্রতি গভীর ভাবে আসক্ত ছিল অর্থাৎ তাঁর মনে জেগেছিল হিন্দুধর্মের বিশেষ সংস্কার এবং কৃষ্টি বোধ । এর অন্তরালে একটিমাত্র কারণই

ছিল। সেটি হচ্ছে, কবীর ছিলেন জনৈকা হিন্দু ব্রাহ্মণ বিধবার পুত্রসন্তান। এছাড়া আরও একটি কারণ আছে। তা হচ্ছে, ভারতবর্ষ হলো সাধু-সন্ত এবং বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রাচীন ধর্ম বেদের জন্মভুমি। সুতরাং এখানকার আকাশ বাতাস এবং মৃত্তিকা এতই পবিত্র এবং স্বর্গসুষমা ও সৌরভে শ্রীমণ্ডিত যে এখানকার মানুষের মনে-প্রাণে ধর্মের বা ঈশ্বর প্রসঙ্গের কণিকামাত্র প্রবেশ অনায়াসেই ঘটে থাকে। তার উপর যদি গ্রহীতার মন-প্রাণ পবিত্র এবং ঈশ্বর-ভাবনায় স্বতঃ অনুপ্রাণিত হয় তো কথাই নেই। যাইহোক কবীরের জীবনে অল্প বয়স থেকেই নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঘটে। তিনি পশুপাখী এবং জীবজন্তুদের ভাষা বুঝতে পারতেন।

একদিন তিনি গঙ্গার তীর ধরে চলেছেন। এমন সময় শুনতে পেলেন কতকগুলি শৃগালের মিলিত কন্ঠস্বর। তিনি শৃগালদের কাছে গিয়ে শুনলেন যে তারা গঙ্গার স্রোতে ভাসমান একটি লোকের মৃতদেহ দেখে পরস্পর বলাবলি করছে, যদি কেউ দয়া করে এই শবটি আমাদের এনে দেয় তাহলে আমরা পেট ভরে খেতে পারি।

তখন দয়ার্দ্রহৃদয় কবীর লাফ দিয়ে জলে পড়লেন এবং শবদেহটি তুলে নিয়ে গঙ্গার ওপর উঠলেন।

ওদিকে গঙ্গার জলে যেসব মাছ ঐ শবদেহটি অনুসরণ করছিল তারা কবীরের ঐ প্রকার কাণ্ড দেখে তাঁকে নানাপ্রকার অভিসম্পাত দিতে লাগলো।

কবীর তখন স্থির করলেন, এ শবদেহ কাউকে না দিয়ে একে প্রাণদান করবেন। তাই করলেন তিনি। তাঁর অলৌকিক আধ্যাত্মিক ক্ষমতার বলে মৃত লোকটি জীবন ফিরে পেল। পরে কবীর তাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের বাড়ীতে চলে এলেন এবং তাকে পুত্রের মতো লালনপালন করতে লাগলেন।

আগেই লিখেছি, কবীর জোলার মন-প্রাণ রাম নামে আসক্ত ছিল যদিও তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মুসলমান পরিবারের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। একদিন কবীর হঠাৎ আকাশ বাণী শুনতে পেলেন, ওগো, তুমি সাধক রামানন্দের কাছে গিয়ে রাম-মন্ত্রে দীক্ষা নাও। তাহলেই তোমার বাসনা পূর্ণ হবে।

এই প্রসঙ্গে ভক্তমাল গ্রন্থে যা ব্যক্ত করা হয়েছে তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি।

“কি জানি কি পুর্বজন্মে সুকৃতি আছিল ।
হঠাৎ শ্রীরামচন্দ্রে মতি উপজিল ।।
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম মাত্র সার ।

অনন্যচিন্তায় দিবানিশি করে পার ।।
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা হইল তাঁহাতে ।
কৃপাবাক্য কহে প্রভু আকাশ-বাণীতে ।।”

আকাশবাণী বা দেববাণী শুনে কবীর ভাবলেন, রামানন্দ কি আমাকে রামমন্ত্রে দীক্ষা দেবেন? আমি যে মুসলমান! তিনি আমাকে ম্লেচ্ছ বলে যদি দূরে সরিয়ে দেন।

পরক্ষণে ভাবলেন, না দেববাণী যখন হয়েছে তখন একবার চেষ্টা করে দেখাই যাক না কেন।

এই ভেবে কবীর একদিন মাঝরাতে চলে এলেন কাশীর বিখ্যাত মণি কর্ণিকার ঘাটে। সেখানে গঙ্গায় নামার জন্যে তৈরি সিঁড়ির ওপর শুয়ে রইলেন। তাঁর ধারণা এই রকমভাবে শুয়ে থাকলে ভোরবেলায় রামানুজ-শিষ্য রামানন্দ যখন গঙ্গাস্নানের জন্যে গঙ্গায় নামবেন তখন তাঁর গায়ে পা ঠেকবে আর তখন তিনি (রামানন্দ) কুকুর মনে করে ঘৃণাভরে ইষ্টদেবের নাম করতে করতে গঙ্গায় নামবেন। তাতেই তাঁর অনেক কাজ হবে। অমন মহাসাধকের পদস্পর্শ এবং নামমন্ত্র শুনে ধন্য হবেন তিনি।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সেদিন রাতেই কবীর চলে এলেন মণি কর্ণিকার ঘাটে। সিঁড়ির ওপর যথারীতি শুয়ে রইলেন।

পরদিন ভোরে রামানন্দজী গঙ্গাস্নান করার উদ্দেশ্যে যেমনি সিঁড়ি বেয়ে নামতে যাবেন অমনি তাঁর এক পা ঠেকল গিয়ে কবীরের গায়ে। তখন ভাল করে আকাশ পরিষ্কার হয়নি। চারিদিকে ধোঁয়ার মত অন্ধকার ঘনিয়ে রয়েছে। রামানন্দ ভাবলেন, তিনি হয়ত একটি কুকুরের গায়ে পা তুলে দিয়েছেন। তাই তাড়াতাড়ি চীৎকার করে বলতে লাগলেন, রাম কহ, রাম কহ।

ঐ কথা শোনামাত্র কবীরের মন-প্রাণ আনন্দে বিভোর হয়ে গেল। ভাবলেন, এই ত আমার পরম ধন বাঞ্ছিত রত্ন পেয়ে গেছি। এই রামমন্ত্রই হবে আমার জীবনে সার ও সত্য।

কবীর তক্ষুনি বাড়িতে এসে মাথার চুল কামিয়ে তিলকমাল্য ধারণ করলেন। সেইসঙ্গে ত্যাগ করলেন গৃহ-কর্ম-জাতি-পাঁতি। তাঁর কাছে এখন থেকে রামনামই হলো একমাত্র সম্বল। ভক্তমাল গ্রন্থে রয়েছেঃ

“গৃহকর্ম জাতি পাঁতি সকল ছাড়িয়া ।
তিলক তুলসীমালা ধারণ করিয়া ।।

সদা সেই মন্ত্র জপ দিবানিশি করে ।
মাতাপিতা বন্ধুগণ সবে তিরস্কারে ।।”

কবীরের ঐ প্রকার পরিবর্তন লক্ষ্য করে তাঁর মা তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন এবং বলতে লাগলেন, তুই কার কাছ থেকে এই বিধর্ম শিক্ষা করলি?

তখন কবীর বললেন, রামানন্দ স্বামী আমাকে এই নাম শিখিয়েছেন।

তাই শুনে কবীরের মাতা রামানন্দের কাছে এসে বললেন, তুমি আমার ছেলেকে শিষ্য করে কেন আমার জাত মান নষ্ট করলে?

রামানন্দ সে কথা শুনে হেসে বললেন, সেকি! কে তোমার ছেলে? কাকে আমি শিষ্য করেছি? কই সে রকম কাউকে ত আমার মনে পড়ছে না!

তখন কবীরের মা বললেন, আমার ছেলের নাম কবীর। তাকেই তুমি রাম মন্ত্রে নাকি দীক্ষা দিয়েছ?

রামানন্দ বললেন, কে সে কবীর? আমি ত কখনো তাকে দেখিনি। কিংবা তাকে দীক্ষা দিই নি।

সেই সময় কবীর এসে রামানন্দের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বললেন, সে কি ঠাকুর! মনে কি পড়ে না, অমুকদিনে আপনি মণিকর্ণিকার সিঁড়ির উপর আমাকে পা দিয়ে স্পর্শ করে ‘রাম কহো’ ‘রাম কহো’ বলে রামনামে দীক্ষিত করেছিলেন।

রামানন্দ কবীরের কথা শুনে প্রেমভরে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, তুমি যে ব্রাহ্মণ হতেও শ্রেষ্ঠ।

ব্রাহ্মণ, শুদ্র বা পতিত বলে আমরা মানুষকে চিহ্নিত করি। তাদের গায়ে এসব পদবী লেখা থাকে না। তাদের কর্মগুণে তারা সমাজে এভাবে শ্রেণীবিভক্ত। তবে এমন অনেক ব্রাহ্মণ আছে যারা নামেই ব্রাহ্মণ অথচ তাদের কর্ম ও আচার-আচরণ শুদ্রের তুলনায় নিম্নমানের। আবার এমন অনেক চণ্ডাল বা শূদ্র আছে যাদের কর্ম ও আচার-আচরণ ব্রাহ্মণের কর্ম ও আচার-আচরণের তুলনায় অনেক বেশী উচ্চমানের। তারা ভগবদ্‌শক্তি অন্তরে মনে উপলব্ধি করে ধন্য হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে এদের কথাই উচ্ছ্বসিতভাবে কীর্তিত হয়েছে। একটি জায়গায় আছেঃ

স্মৃতঃ সদ্ভাষিতো বাপি পূজিতোদ্বিজোত্তমাঃ ।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া ।।

অর্থাৎ, দ্বিজোত্তমগণ! ভগবদ্ভক্ত চণ্ডাল হয়েও যে কোনরূপে স্মৃত, সদ্ভাসিত বা পূজিত হলে পবিত্র করে থাকেন।

উক্ত মহান শাস্ত্র-গ্রন্থের অন্যত্র উক্ত হয়েছেঃ

'ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে ভাগবতা মতাঃ ।
সর্ব্বর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে ।।'

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্র নন, কিন্তু তাঁরা ভাগবত বলেই অভিমত। সব বর্ণের মধ্যে তারাই শূদ্র যারা জনার্দনের ভক্ত নয়।

পরম ব্রহ্মকে যে উপলব্ধি করতে পেরেছে তারাই তো প্রকৃত ব্রাহ্মণ। নচেৎ কেবল গলায় উপবীত ধারণ করলে কেহ ব্রাহ্মণ হয়না। ওটা তো বাহ্যিক আচরণ – ট্রেড মার্কের মত পাঁচ জনের কাছে বিজ্ঞাপনী বস্তু। আর পরমব্রহ্মকে যে উপলব্ধি করতে পেরেছে, সামাজিক প্রচলিত নিয়মে সে শূদ্র হলেও সেই-ই যথার্থ ব্রাহ্মণ। তাই পরম ভাগবত মহাত্মা কবীর ম্লেচ্ছঘরে মানুষ হয়েও পরম ব্রাহ্মণ – নিষ্ঠাবান বিপ্র।

রাম নামে তন্ময়চিত্ত কবীর সংসারের সব কাজই করতেন। বিন্দুমাত্র অবহেলা ও অশ্রদ্ধা দেখাতেন না। আবার বৈষ্ণব দেখলেই পরম বৈষ্ণব কবীর মুক্তহস্তে তাঁর কাছে যা থাকতো তাই দান করতেন। একবার হাটে গিয়েছেন কবীর হাতে বোনা কাপড় বেচতে। সেখানে এক অভাবী বৈষ্ণবকে দেখে তিনি সেই কাপড়খানা তাকে দান করলেন। তখন তাঁর মনে জাগলো না মায়ের কথা। তিনি সেই কাপড়খানা বিক্রী করে মায়ের জন্য চাল কিনে নিয়ে যাবেন আর সেই চাল দিয়ে ভাত রান্না হলে কবীর এবং তাঁর পরিবার খেতে পাবেন।

কিন্তু কবীরের ইষ্টদেবতা স্বয়ং রামচন্দ্র কবীরের বেশে এসে কবীরের মায়ের কাছে একঝুড়ি আনাজপত্র রেখে গেলেন। কবীর জননী তাই লক্ষ্য করে একদিকে যেমন আনন্দ বোধ করলেন, তেমনি অন্যদিকে মনের কোণে জমে উঠলো সন্দেহ মেঘের কালোছায়া। তিনি কবীরবেশী রামচন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন, একি তুই এত জিনিস পেলি কোথা থেকে? বোধহয় কোনখান থেকে চুরি করে এনেছিস?

কবীররূপী রামচন্দ্র সে কথার জবাব না দিয়ে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।

ওদিকে কবীর ঘরে ফিরে অত জিনিস দেখে মাকে প্রশ্ন করলেন, মা, অত জিনিস কোথা থেকে এলো?

কেন বাছা, তুই যে এইমাত্র এই সব জিনিস এনে রেখে গেলি!

মার কথা শোনা মাত্র ভক্ত কবীর – চিরকালের ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ কবীর বুঝতে পারলেন এ আর কারও কাজ নয়, এ হচ্ছে তাঁর ইষ্টদেবতা স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের অপার লীলাকৌশল। তাই মনে করে কবীর তাঁর উপাস্য দেবতাকে মনে মনে প্রণাম করলেন। পরে সেই সব প্রচুর দ্রব্যসম্ভার বিলিয়ে দিলেন বৈষ্ণবদের।

দিন দিন ভক্ত কবীরের ভগবদ্ভক্তির কথা চারদিকে রটতে লাগলো। অনেকে কবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তবে ব্রাহ্মণেরা কবীরের এই সুখ্যাতি ভাল নজরে দেখলেন না। তাঁরা ভক্ত কবীরকে জব্দ করার জন্যে উঠেপড়ে তাঁর বিরুদ্ধে লাগলেন। তাঁরা কাজীর মাধ্যমে বাদশার কাছে কবীরের বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন।

বাদশাও কবীরকে নানারকম শাস্তি দিতে লাগলেন। কখনো কবীরকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করার জন্য আদেশ দিলেন, কখনো বা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই কবীর শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় রক্ষা পান। তাই লক্ষ্য করে স্বয়ং বাদশা কবীরের প্রতি একান্ত আনুগত্য প্রকাশ করেন। তাঁর পরম পুণ্য পদধূলি গ্রহণ করে নিজের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

কবীরের বহু শিষ্য ছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন হিন্দু, আবার অনেকে মুসলমান। কবীর ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পাটনার কাছে গোরক্ষপুরে দেহত্যাগ করলে মহা অনর্থ উপস্থিত হলো। তাঁর মৃতদেহ দাহ করার জন্য হিন্দুরা দাবী করলো। আবার মুসলমান শিষ্যরা দাবী করল তাঁর মৃতদেহ সমাধি দেবার জন্য। অথচ একই দেহ দিয়ে এই দুই কাজ কি সম্ভব? কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান যেমন ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে থাকেন তেমনি পরম ভাগবত মহাত্মা কবীর তাঁর ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্য নিজের মৃতদেহকে ফুল ও তুলসীপাতায় রূপান্তরিত করে দিলেন। বিবদমান দুই দল – হিন্দু-মুসলমান শিষ্যগণ বস্ত্রাবৃত কবীরের মৃতদেহ থেকে বস্ত্রখানি উন্মোচন করে দেখতে পেলেন সেখানে মৃতদেহের পরিবর্তে পড়ে রয়েছে কিছু ফুল আর তুলসীর পাতা।

তখন কিছু ভক্তগণ মহানন্দে তুলসী পাতাগুলি সংগ্রহ করে গঙ্গাঘাটে দাহ করলেন। আর মুসলমান ভক্তরা ফুলগুলি নিয়ে কাশীর কবীরচৌরাতে সমাধিস্থ করলেন।

বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ লেখেন মহাত্মা এবং পরম ভক্ত কবীর। তার মধ্যে বীজক নামে গ্রন্থখানিতেই তাঁর ধর্মবিষয়ক মতামত প্রকাশ পেয়েছে। তিনি

কতকগুলি দোঁহাও লেখেন। তার মধ্যে সর্বকালের জন্য মূল্যবান একটি দোঁহা এখানে উদ্ধৃত করছি।

"জিন জিন সম্বল না কিয়া, অসপুর পাতন পায়,
ঝাল পরে দিন আখয়ে সম্বল কিয়া ন জায়।।"

অর্থাৎ এমন মানব জীবন লাভ করে সময় থাকতে যদি পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয় না করে, তাহলে জীবন-সূর্য্য অস্ত যাবার সময়েও কিছু সঞ্চয় করতে পারবে না।

কবীর ছিলেন ভারত জননীর মহান সন্তান। তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার প্রিয় ছিলেন। তাঁর মত মহান সাধকের ব্যক্তিত্ব প্রতিটি ভারতীয়ের কাম্য বস্তু হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীমায়ের আহ্বান **শ্রীমা**

এমন সব লোক আছে যারা দুঃসাহসের কাজ করতে ভালবাসে। সেই সব লোকদিগকেই আমি আহ্বান করে বলছিঃ

"বিরাট দুরূহ কাজের জন্যই আমি তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করি। এই দুঃসাহসিক সাধনায় আমরা সেই সব আধ্যাত্মিকতার পুনরাবর্তন করবো না যা অপরে অতীতে করেছে। আমাদের যাত্রা সুরু হবে পূর্বের আধ্যাত্মিকতার শেষ সীমানা থেকে। আমরা নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে চাই, একেবারেই নতুন জগৎ। আমাদের সাধনার পথ অদৃষ্টপূর্ব বিপদ-আপদ সঙ্কুল। এই পথে চলা প্রকৃতই দুঃসাহসিকতা। সুনিশ্চিত বিজয়ই আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু ইহার পথ আমাদের অজ্ঞাত। পদে পদে পথনির্মাণ করে আমাদিকে অগ্রসর হতে হবে। এই পথ চলেছে অজানার রাজত্বে। যে উপলব্ধি আমাদের লক্ষ্য তা এই বর্তমানের বিশ্বে কোনদিন প্রকাশিত হয় নাই, এবং এমন ভাবে আর কোনদিন প্রকাশিত হবেও না। এই লক্ষ্যের প্রতি তোমাদের যদি আকর্ষণ থাকে তাহলে চলে এসো আমরা যাত্রা করি। আগামীকাল আমাদের জন্য কী আনবে তা আমি জানি।

অতীতে যা দেখেছি, যা করবার সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে করেছি, মনে মনে যে সৌধ গড়ে তুলেছি- সে সবই পিছনে ফেলে আমরা অজানার পথে অগ্রসর হব- ভাগ্যে মোদের যা থাকে তা হোক ।

DO NOT COPY

জীবনানন্দের ধূসর জগৎ **শ্রী দিব্যজ্যোতি রাহা**

আমাদের এই পৃথিবীর মাঝেই অন্য আরেক অচেনা কুয়াশাচ্ছন্ন জগতের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল জীবনানন্দ দাশের কবিতার মাধ্যমে, স্কুলজীবনে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সরোজ পাল মহাশয়ের হাত ধরে। বুদ্ধিদীপ্ত মন দিয়ে যেমন সজ্ঞান পরিচয় হয়, ঠিক তেমনটি নয়। বরং জীবনানন্দের কাব্যজগতে প্রবেশ করলে আমাদের চেতনা কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। সেই অর্ধ-চেতনার অস্পষ্ট আলোকে চারিদিক কেমন যেন ধূসর এবং রহস্যাবৃত হয়ে ওঠে। পরিচিত বস্তুগুলিও কেমন যেন অচেনা ঠেকে। অথচ তার মাঝেই এক সুগভীর সত্যের ইঙ্গিত আমাদের কাছে পৌঁছে যায়, সেখানেই জীবনানন্দের প্রতিভার স্বকীয়তা।

জীবনানন্দের কবিতার জগৎটি সত্যিই বিস্ময়কর। এখানে বস্তুর অবয়ব আছে অথচ যেন বস্তুভার নেই। অনেকটা যেন আকাশে ভেসে থাকা মেঘের মতো। কোথাও জমাট বেঁধে রয়েছে, আবার কোথাও বাষ্প হয়ে উবে যাচ্ছে। কেবলই রূপান্তরিত হচ্ছে। রূপের বৈচিত্র্য আর রঙের খেলার অন্ত নেই। অথচ সব কিছু থেকেই যেন ঝরে পড়ছে ম্লান ধূসর আলোর এক করুণ বিষণ্ণতা। কখনো এক অবয়বের সাথে আরেক অবয়ব মিলে যাচ্ছে। কখনো বা একটি রঙের সাথে আরেক রঙ মিশে গিয়ে ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। অথচ প্রতিটি কবিতার শেষে পাঠক অনুভব করছে, ওই জগতের সাথে তার চেতনার কোথাও যেন একটা মিল আছে। তাই জীবনানন্দের কবিতার রেশ আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এ যেন চেতন-অচেতনে মেশানো এক স্তিমিত আলোর জগৎ, যা কবির লেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

"পথ ঘাট মাঠের ভিতর
আরো এক আলো আছে; দেহে তার বিকেলবেলার ধূসরতা।
চোখের দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর।"
... (মৃত্যুর আগে)

এখানে কবি তাঁর রহস্যময় উপলব্ধির কথা প্রকাশ করেছেন। রূপ যেখানে

ধূপবাষ্প, সেই জগৎটিকে কবি প্রতীকী ব্যঞ্জনার সাহায্যে আমাদের অবচেতন মনের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

জীবনানন্দের প্রায় প্রতিটি কবিতার ছন্দই অসমচ্ছন্দ। জলস্রোতের উদ্দামতা তার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং তাঁর কবিতা যেন উপলখণ্ডের বাঁধা ডিঙিয়ে মন্থরগতিতে বয়ে চলা স্রোতস্বিনী। অজস্র ড্যাশ, কমার বাঁধে ঠেকে ঠেকে উদাস, অলস গতিতে বয়ে চলেছে। উৎসাহের তাড়া নেই, বরং রয়েছে অবসাদের মধুর ক্লান্তি। যেন বহুদূর থেকে সেই সুর আমাদের কানে ভেসে আসছে।

"হেমন্তের মধ্যরাতে
দক্ষিণসাগরগামী হরিয়াল বুনো হাঁসদের
রাশি রাশি কালো বিদ্যুতের বিন্দু,
ডানার ঝাপসা গুঞ্জরণ
– দেখেছি জেনেছি অনেক দিন –
মানুষের সাথে
মিলন বা অমিলের কঠিন রহস্যসুতো নিয়ে
সময়ের অজ্ঞেয় সাগরতীরে গিয়ে ধীরে ধীরে হৃদয়ের ক্ষয়
দেখেছি মানবদের ইতিহাসে বারবার হয়।" ... (নদী)

জীবনানন্দের কবিতা পড়তে পড়তে যে ছবি আমাদের মানসচক্ষে ভেসে ওঠে, সেগুলো সব মৃদু রঙে আঁকা। তাঁর কবিতার সুর যেন আগাগোড়া নীচু তারে বাঁধা। ইংরেজিতে বললে subdued tone. যেমন –

"আমার এ গান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে,–
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে,–
তবুও হৃদয়ে গান আসে!
ডাকিবার ভাষা
তবুও ভুলি না আমি,–

DO NOT COPY

তবু ভালোবাসা
জেগে থাকে প্রাণে!
পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান!
কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা, - জানি আমি -
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে
তবুও হৃদয়ে গান আসে!" ... (সহজ)

উপরের কবিতার কথা যেন শেষ হয়েও শেষ হয় না। তার বিষণ্ন সুরের রেশ যেন পাঠকের মনে অনুরণিত হতে থাকে বহুক্ষণ ধরে।

কবি জীবনানন্দ দাশ সব সময়েই যেন চেতন-অচেতনে মেশা এক প্রচ্ছন্ন-লোকের অধিবাসী। কবি নিজেই বলছেন,

"আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময়ে যেন থেমে যায়, -- একটি পৃথিবীর অন্ধকার ও স্তব্ধতায় একটি মোমের মতো যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে-সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, সে-সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না ..." ... (কবিতার কথা)

জীবনানন্দের কাব্যের রসাস্বাদন করতে হলে কবির উপরোক্ত উক্তিকে সম্যক বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। সজ্ঞান চেতনা যতক্ষণ কবির মনকে অধিকার করে রাখে, ততক্ষণ কবির কাব্যরচনার অনুকূল লগ্ন আসন্ন হয় না। এই ব্যবহারিক জীবনের মৃদুতম সচেতনতাও যখন কবির কাছে থেমে যায়, সকল ভেদাভেদ জ্ঞান লুপ্ত হয়ে আসে, তখনই কবি তাঁর সত্তার গভীরে বৃহত্তর এক অখণ্ডতাকে অনুভব করেন। মহাসমগ্রতার সাথে তাঁর ব্যক্তিসত্তার সাযুজ্যে কবির হৃদয় একটি মোমের মতো জ্বলে ওঠে। কবির স্তিমিত চৈতন্যের সেই মৃদু রহস্যময় আলোতেই তিনি তখন জগতের সব কিছুকে প্রত্যক্ষ করতে থাকেন এবং সেই ধূসর জগতের সব কিছুর সাথেই তাঁর নতুন করে এক

DO NOT COPY

বিস্মিত পরিচয় ঘটতে থাকে। কবির প্রতিটি কবিতায়, প্রতিটি পংক্তিতে এই বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

এইখানেই জীবনানন্দের কবিতার মূল সৃষ্টিরহস্য লুকিয়ে আছে। সেই অর্ধস্ফুট চেতনার অবস্থাতেই কবির হৃদয়ে কবিতার জন্ম হয়। তাঁর সত্তার এই গভীর বোধ সম্বন্ধে কবি নিজে বলেছেন,

"আলো-অন্ধকারে যাই -- মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে;
স্বপ্ন নয়, শান্তি নয়, ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়;
তারে আমি পারি না এড়াতে, ..." ... (বোধ)

এই বোধ একবার কবির হৃদয়ে জন্ম নেওয়ার পরে কবির কাছে জগৎ-সংসার এক নূতন দ্যোতনা নিয়ে আসে। কবি বলছেন,

"সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে।
..... তাদের মতন ভাষা কথা
 কে বলিতে পারে আর; ...." ... (বোধ)

অতি সাধারণ পরিবেশও তখন কবির চারিদিকে এক নূতন কূহক সৃষ্টি করে। কবির দৃষ্টিতে সবকিছুই তখন বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণে গভীর ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে।

"মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা
রূপসীর সাথে এক; সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা
প্রাণে তার - ম্লান চুল, চোখ তার হিজলবনের মতো কালো..."-(সিন্ধুসারস)

এ'ধরণের অসংখ্য পংক্তিতে তার আভাস পাওয়া যায়।

জীবনানন্দের কবিতায় এ'ভাবেই বিচিত্র রূপকল্পনাকে আশ্রয় করে নরম আলোছায়ার নানান ভাঙাগড়া চলতেই থাকে। আবার কখনও বা ঘটে যায়

DO NOT COPY

দুই বা অধিক ভিন্ন ইন্দ্রিয়চেতনার এক অভাবনীয় অথচ নিবিড় ব্যঞ্জনাময় মিশ্রণ। যেমনটি দেখি এই পংক্তি দু'টিতে:

"শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল," ... (বনলতা সেন)

অথবা, এই অংশটিতে:

"আমারে সে নিয়েছিল ডেকে;
বলেছিল: এ' নদীর জল
তোমার চোখের মতো ম্লান বেতফল;
সব ক্লান্তি বিহ্বলতা থেকে
স্নিগ্ধ রাখছে পটভূমি
এই নদী তুমি।" ..... (সে)

জীবনানন্দ তাঁর অননুকরণীয় ভাবকল্পনায় বহু বিচিত্র রূপভঙ্গিমা ও রূপসম্ভাবনাকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কবিতার সর্বত্র উপমার এই আশ্চর্য দ্যোতনা ছড়িয়ে রয়েছে। তার শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বেশি পরিচিত উদাহরণ বোধ হয় এই পংক্তিটি –
"পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।"...বনলতা সেন)

একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে জীবনানন্দের রূপকল্পনার বিবিধ বৈচিত্রের মাঝেও কয়েকটি প্রধান ভাব প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাগুলির সৌন্দর্যে যেন এক ম্লান বিষণ্নতা ছেয়ে আছে। কবির সমগ্র কাব্যজগৎ জুড়ে রয়েছে এক অবসাদের ছায়া; সর্বত্র বেজেছে একটি বেদনার সুর। তার সাথে সাথে এক ধূসর রহস্যময়তা এবং এক অবয়বহীনতার ভাব কবির কাব্যজগতের প্রধান স্বরূপলক্ষণ। উদাহরণস্বরূপ এই পংক্তি দু'টির উল্লেখ করা যেতে পারে:

"গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের – ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে

DO NOT COPY

অল্পপ্রাণ দিনের মতন।" ..... (সিন্ধুসারস)

এই অপূর্ণতার সাথে সাথেই কিন্তু কবির কাব্যচেতনা মহাসমগ্রতার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে:

"মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
আরো ভালো -- আরো স্থির দিকনির্ণয়ের মতো
চেতনার পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ
কতোদূর অগ্রসর হয়ে গেল জেনে নিতে আসে।" ..... (মানুষের মৃত্যু হলে)

জীবনানন্দ সম্পর্কে কবি বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'তিনি পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া রোমান্টিক।' জীবনানন্দের এই রোমান্টিকতা কিন্তু একেবারেই তাঁর নিজস্ব ঘরাণার। ভাবের দিক থেকে তিনি ছিলেন তদানীন্তন আধুনিক কবিদের বিপরীতধর্মী। প্রতিটি মুহূর্তের জন্মলগ্নেই সেই মুহূর্তের মৃত্যু নির্দিষ্ট, এই মৃত্যুচেতনা তাঁর কাব্যসৃষ্টিকে এক বিষণ্ন সুরে সর্বদা বেঁধে রেখেছে। অথচ তাঁর কবিতায় জীবনের প্রতি নিবিড় অথচ বিষণ্ন এক ভালোবাসা ছত্রে ছত্রে বিধৃত হয়ে আছে।

"আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে-- এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয় হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;" .....(রূপসী বাংলা)

একদিকে যেমন জীবনের প্রতি অসীম মায়ায় জড়ানো এই করুণ বিষণ্ণতা ছেয়ে আছে জীবনানন্দের প্রায় সব কবিতা জুড়ে, অপরদিকে আবার কোন কোন কবিতায় মৃত্যুকে দলিত করে জীবনের গভীর জয়গান তিনি গেয়েছেন। যেমন 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটির এই অংশটি।

"তবুও তো পেঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে

আরেকটি প্রভাতের ইশারায় -- উষ্ণ অনুরাগে।

....

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
খুরখুরে অন্ধ প্যাঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে,
চোখ পাল্টায়ে কয়: 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
চমৎকার!
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার --'
হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার?
আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো -- বুড়ি চাঁদটারে আমি
করে দেবো কালীদহে বেনোজলে পার;
আমরা দু'জনে মিলে শূন্য করে চলে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।"

.....(আট বছর আগের একদিন)

জীবনের প্রতি কবির গভীর অনুরাগ উপরের পংক্তিগুলিতে অতুলনীয়ভাবে প্রকাশিত হলেও কবি তাঁর মৃত্যুচেতনার কারণে জীবনকে সানন্দে উৎসবময় করে আস্বাদন করতে পারছেন না। প্রতি মুহূর্তেই কবি জীবনের দেহে মৃত্যুর হিমস্পর্শ অনুভব করে চলেছেন:

"এই তো জীবন;
সমুদ্রের অন্ধকারে প্রবেশাধিকারে ..... (উন্মেষ)

"মানবের মরণের পরে তার মমির গহ্বর"
..... (ক্ষেতে প্রান্তরে)

দিনের আলোর দিকে তাকালেই দেখা যায় লোক
কেবলি আহত হয়ে মৃত হয়ে স্তব্ধ হয়" ..... (জনান্তিকে)

অখণ্ড সমগ্রতার দৃষ্টিতে জীবনকে সর্বদা মৃত্যুর পটভূমিতে দেখতে পেলেও এই মৃত্যুপীড়িত জীবনের জন্য কবির অন্তরাত্মা বেদনার্ত হয়ে ওঠে।

জীবনানন্দের প্রবাহমান কালচেতনা তাঁর এই বেদনাকে আরো করুণ

DO NOT COPY

করে তুলেছে, তাকে আরো ব্যাপ্তি প্রদান করেছে। অতীতের কত বিলুপ্ত সময়ের মানুষেরা, যারা একদিন জীবনকে ভালোবেসে এই পৃথিবীর বুকে বিচরণ করেছিল, আজ যারা ধূসর স্মৃতিতে পরিণত, কবিমন বহু যুগ পরেও আজ তাদের সাথে একাত্মতা অনুভব করছে যা বিধৃত হয়ে আছে এই পংক্তি দু'টিতে:

"মনে হয় কোনো বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে"

অথবা, এই অংশটিতে :

"আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ,
আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা
আর তুমি নারী
....
তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না খুঁজি না।" .... (নগ্ন নির্জন হাত)

বর্তমান কালের মধ্যেও অতীতের সত্তা মিশে আছে, প্রতি মুহূর্তেই বর্তমান অতীতকে বহন করে চলেছে। এই বোধ থেকেই জন্ম নিয়েছে জীবনানন্দের কালজয়ী এই পংক্তিগুলি :

"হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;"...(বনলতা সেন)

কবি যখন বর্তমান সময়ে জীবনের সফেন সমুদ্রে বিচরণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং যার নিভৃত সান্নিধ্য কবিমন 'দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল' বলে আজও কামনা করে, সেও তো অর্ধেক অতীত:

DO NOT COPY

"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য;" ... (বনলতা সেন)

কালজয়ী কবিতাটির মধ্যে বর্তমান সময়ের থেকে অতীতের বিচ্ছেদবেদনা বারবার অনুরণিত হয়েছে। বর্তমান সময়ের অসহায়তার মাঝেও কবিমন অতীতচারী হয়েছে; ক্ষণিকের আশ্রয় খুঁজে ফিরেছে অতীতের প্রিয় নারীর কাছেই।

কালচেতনার এই নিরন্তর দোলাচল, অতীত থেকে বর্তমানের বিচ্ছেদজনিত কবিমনের এই দীর্ঘশ্বাস জীবনানন্দের একান্তই নিজস্ব। তা একদিকে যেমন কবিকে নির্জনতা, নিঃসঙ্গতার অনুভব দিয়েছে; অপরদিকে তাঁর কাব্যসৃষ্টিকে করে তুলেছে বিষাদ-করুণ। কবির মনে যুগ-যুগান্তর ধরে সঞ্চিত এই অবসাদ তাঁর কাব্যজগৎকে ম্লান-ধূসর এক স্বল্প আলোকে গোধূলির মতো ছায়াময় করে রেখেছে।

তাঁর কবিতায় যে জীবনপ্রতিমাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার দেহেও এই ধূসরতা। বুকে বিচ্ছেদের বেদনা নিয়েও তার মুখটিতে মৃত্যুকে পার করে যাওয়া বিষণ্ন হাসি। জীবনানন্দের ধূসর কাব্যজগতে এই ম্লান হাসিটি চিরন্তন হয়ে রয়ে গেল।

❀ ❀

"যে সব পরিবর্ত্তন আজ আমরা দেখেছি জগতে, তা হল বুদ্ধিগত, সুনীতিগত আর স্থূলক্ষেত্রগত, আদর্শ হিসাবে এবং উদ্দেশ্য হিসাবে। আধ্যাত্মিক রূপান্তর তার সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে, আপাততঃ শুধু এখানে ওখানে তার ঢেউ তুলে দিয়েছে। যে পর্য্যন্ত তা নিজে এসে উপস্থিত না হয়েছে, সে অবধি অন্যগুলির মর্ম্ম বুঝা যাবে না, সে অবধি বর্তমান ঘটনাবলীর অর্থ নির্ণয় আর মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব পূর্ব-জল্পনাই নিরর্থক- কারণ আধ্যাত্মিক গতিরই প্রকৃতি, শক্তি আর ক্রিয়া নির্দ্ধারণ করবে মানব জাতির আগামী যুগচক্র।"

--শ্রীঅরবিন্দ

DO NOT COPY

বৈতরণী পার

শ্রীমতী বাণীপ্রভা মালব্য

ফেলে আসা দিনগুলো
কেন পিছু ডাকে?
যখন থাকি কোলাহলে
তখন তারা কোথায় থাকে?
একলা পেলেই চেপে ধরে
ডোবায় স্মৃতির তলে,
“আমরা তোমার সঙ্গে আছি
ভুলনা,” আমায় বলে!
বর্তমানের কঠিন চাকায়
মানুষ হলে নাজেহাল,
অতীতের স্মৃতির ছায়ায়
ক্ষণিক খুশির পাল!
তরতরিয়ে নিয়ে যায়
বাস্তব থেকে দূর,
নতুন করে বাঁচতে শেখায়
মেঠো বাঁশির সুর।!
এমনটি না হলে শোনো
বাঁচা হত ভার।
সঠিক সময় এলে হবে
বৈতরণী পার!

DO NOT COPY

কালো ছত্রাক **সুনন্দন ঘোষ**

কালো ছত্রাক ছড়িয়ে পড়ছে মহামারীর আগ্রাসন নিয়ে।
ছড়িয়ে পড়ছে দুর্বল ফুসফুস থেকে মস্তিষ্কে,
ছড়িয়ে পড়ছে সম্রাজ্ঞীর হাতের রাজদণ্ডে।

কোভিড-১৯ এর কোভ্যাক্সিন বানিয়েছি আমরা।
মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে পৌঁছে দিয়েছি মহাকাশযান।
এগিয়ে গেছে ঘড়ির কাঁটা।
বদলে গেছে সংস্কৃতি।
ছোটবেলায় খোঁড়াকে খোঁড়া বলতাম না।
আজও বলিনা।
সহিষ্ণুতার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছি ঘুণধরা শিরদাঁড়া।
এখন প্রভাবশালী তস্করদের দেশনায়ক বলি।

উন্নয়নের স্বঘোষিত কাণ্ডারিরা অভিন্ন ছন্দে
মায়াজাল তৈরি করেন রাজ্যে, নৈরাজ্যে।
দেশরক্ষার শপথ নিয়ে মান্যবরেরা হাত বাড়ান
আলিবাবার থলিতে।
অনুগতের অর্থলিপ্সাকে ন্যায়সঙ্গত করার তাগিদে
সিংহাসন থেকে নেমে পাথরছোঁড়া জনতার ভিড়ে
পা রাখতে হয় সম্রাজ্ঞীকে।

ভেঙ্গে যাচ্ছে শরীরের-মনের প্রতিরোধ।
অবক্ষয় থেকে অতিমারী চুঁইয়ে চুঁইয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে
শরীর থেকে সমাজে।
প্রতিমুহূর্তে বুঝতে পারি হেরে যাচ্ছি।

তবুও বিশ্বাস করি –
একদিন ছিন্ন হবে ঐ অবমানুষগুলোর প্রতারণার শৃঙ্খল,
মুছে যাবে প্রাণঘাতী কালো ছত্রাকের অসহনীয় স্মৃতি।

DO NOT COPY